বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন: গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি[১]

ড. আবুল বারকাত

বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ কি ও কেন বলতে চেয়েছি

'ফরেন এইড' – একটি সমগ্র শিল্প (Aid as Industry) এবং সেই সাথে নির্ভরশীলতারি সংস্কৃতির (culture of dependency) ভিত্তি ও বাহন। 'ফরেন এইড' হ'ল দাতাগোষ্ঠি (কেন্দ্র) কর্তৃক গ্রহিতাকে (প্রাপ্ত) একটি নির্ভরশীল কাঠামোর মধ্যে পরিচালনের শিল্প। 'ফরেন এইড' শিল্পটি দাতাগোষ্ঠির স্বার্থে সুক্ষ্ম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সচেতনভাবে পরিচালিত হয়। 'ফরেন এইড' নামক স্বার্থ-সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে যে সব স্বার্থ চরিতার্থ হয় সেগুলো হতে পারে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যময়াদী, দীর্ঘমেয়াদী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক। স্বার্থ সংরক্ষণের 'শিল্প' হিসেবে এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত হল দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক, সমাজিক ও অর্থনৈতিক এলিটশ্রেণী – ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, পরামর্শক ইত্যাদি। 'ফরেন এইড' নামক শিল্পটিকে এদের সকলের জীবনযাত্রা, মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণ নিমিত্ত একটি কামধেনুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যার শেষ ফলটি আবার তুলনা করা যেতে পারে মোল্লা নাসিরউদ্দিন হোঁজ্জার সেই গল্পের সাথে যেখানে তার প্রশ্ন "এটা বিড়াল হলে (বাজার থেকে কেনা) মাংস কোই, আর এটা মাংস হলে বিড়াল কোই" (আর আমাদের প্রশ্ন – এর নাম উন্নয়ন হলে বিদেশি সাহায্য কোই, আর এর নাম বিদেশি সাহায্য হলে উন্নয়ন কোথায়)। সেইসাথে 'ফরেন এইড' যেহেতু নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেই চলেছে সে হেতু আমাদের মানসিক কাঠামো ঠিকঠাক রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নামকরণের ক্ষেত্রেও যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে সেটা লক্ষণীয়। যেমন, 'ফরেন এইডের' (বৈদেশিক সাহায্য) জায়গায় বলা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স' (উন্নয়ন সহযোগিতা), 'ডোনার' (সাহায্যদাতা)-এর জায়গায় বলা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনার' (উন্নয়ন সহযোগী), 'এক্সটারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন' এর জায়গায় বলা হচ্ছে 'বাংলাদেশ ডেভেলাপমেন্ট ফোরাম'। ফরেন এইড সংস্কৃতির দিক থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল টার্মগতভাবে যতো বেশি উদারতা দেখানো হচ্ছে ঠিক ততবেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাংক-ক্রাট, ইউরোক্রাটসহ 'উন্নয়ন সহযোগীদের' উপদেশ খয়রাতের মাত্রা।

মূল প্রবন্ধের প্রথম খসড়ার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখে দেবার জন্য প্রবন্ধকার অনেকের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধ রচনার বিভিন্ন পর্বে প্রবন্ধকার অনেকের সাথে আলোচনা করেছেন। বিশ্লেষণ কাঠামো শক্তিশালী করতে যারা উদারভাবে তাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন ও মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের প্রতি প্রবন্ধকার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ দিক থেকে যাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তারা হলেন ড. মইনুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেরশ অর্থনীতি সমিতি, ড. সায়েদুল হক খান, অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শফিক উজ জামান, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মতিউর রহমান, অধ্যাপক ও সভাপতি, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মোজাম্মেল হক, উন্নয়ন গবেষক; মু: আজিজুর করিম, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, ও জনাব সেলিম রায়হান, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এদের প্রায় সকলেই বিশেষ করে ড. মইনুল ইসলাম ও ড. সায়েদুল হক খান বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ে এমন কয়েকটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেগুলো প্রবন্ধের প্রথম খসড়ায় যথেষ্ট মাত্রায় বিশেষিত হয়নি অথচ হলে ভাল হত। প্রবন্ধ রচনার শুরু থেকে অনুপ্রেরণা যোগান দেয়া ও প্রস্তাবনার বহুমাত্রিক সম্পর্কে চিন্তা উদ্রেগকারী বিষয়াদি উত্থাপনসহ খুঁটিনাটি বিষয়ে উচ্চমানসম্মত পেশাগত ও সহযোগিতার জন্য প্রবন্ধকার ড. মইনুল ইসলামের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

[১] বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন?" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তন, ঢাকা

গত তিন দশকে বাংলাদেশে আনুমানিক ১৮০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ 'ফরেন এইড'[২] বা বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য ইনজেক্ট করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহিত হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে - অন্ততঃ আনুষ্ঠানিকভাবে সেটাই বলা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যম হিসেবে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দেয়া হয় যে ঐ সম্পদ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ফারাক দূর করতে সাহায্য করে, লেনদেনের ভারসাম্য মেটাতে কাজে লাগে, এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিবেশে দ্রুতহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সরকারি ব্যয় মেটাতে সাহায্য করে। আর গত দুই দশকে খাতওয়ারি বিন্যাস ঋণ, কাঠামোগত বিন্যাস ঋণ ও কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির (Structural Adjustment Programme, SAP) আওতায় বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ প্রক্রিয়াকে কেউ কেউ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ অন্যান্য সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করে উক্ত ঋণ-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে সচেষ্ট হন।

"বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কতখানি প্রয়োজন" বিষয়টিকে আমরা এই নিরিখে দেখছি না যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হুবহু কি পরিমাণ (কোন্ খাতে, কোন্ অবস্থায় ইত্যাদি) ঋণ-সাহায্য প্রয়োজন সেটা নির্ধারণে প্রচেষ্টা নেয়া। বরঞ্চ সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আমরা গুণগত দিক থেকে মানব উন্নয়নের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের প্রয়াস নিয়েছি। আমাদের বিশ্লেষণ প্রয়াসটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক দিক থেকে পলিটিক্যাল ইকনমিক। আমরা মনে করি মানব উন্নয়ন হ'ল স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া (development: a freedom-mediated process); যেখানে গণমানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে - অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunities), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচছতার গ্যারান্টি (transparency guarantee), এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা (protective security)। এসব স্বাধীনতা আবার সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহের সাথে এসব স্বাধীনতার সম্পর্কের (ত্বরান্বয়নকারী অথবা ধনাত্মক, এবং পশ্চাদগামী অথবা ঋণাত্মক) বিশ্লেষণই নির্দেশ করবে 'এইড' কতখানি প্রয়োজন/অপ্রয়োজন। এই প্রবন্ধে সে ধরনের একটা প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। আর সে কারণেই পদ্ধতিতাত্ত্বিক দিক থেকে মূল বিশ্লেষণটি পলিটিক্যাল ইকনমিক।

সম্পূর্ণ বিষয়টি বিশ্লেষণে আমরা যে কাঠামো অনুসরণ করেছি ও যা বলতে চেয়েছি সেগুলি নিরুরূপঃ

প্রথমতঃ বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্বগত উপসিদ্ধান্তসমূহ যে নিঃশর্ত সিদ্ধ নয় সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গত তিন দশকে আমাদের দেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে তার ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম যত না ত্বরান্বিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি ঘটেছে ঋণগ্রস্ততাজনিত দায়ভারের বোঝা, বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে জনগণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ (basic needs) পূরণের ক্ষেত্রে (যা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব) বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা নগণ্য। দেখানো হয়েছে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য নির্ভরতার সাথে জনকল্যাণের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান

[২] "ফরেন এইড" টার্মিনোলজির বঙ্গানুবাদ ও সারার্থ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত। 'ফরেন এইড' এর বঙ্গানুবাদ করা হয় 'বৈদেশিক সাহায্য'। আবার 'ফরেন এইডের' অন্তর্গত উপাদান হল ঋণ (loan) ও অনুদান (grant), যেখানে অনুদানকে হয়ত বা 'সাহায্য' অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে। 'হয়ত বা' এজন্য বলছি যে cross-conditionalities-এর কারণে অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ অনুদান অন্য আর একটি অনুদান এবং/অথবা ঋণের শর্ত হিসেবে কাজ করে। যে কারণেই বিষয়টির শিরোনাম বড়জোর হতে পারে "ঋণ ও সাহায্য" (loan and grant/aid)। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'ঋণ' নামক প্রপঞ্চটির উপস্থিতি ও অনুদানে নিহিত শর্তের কারণে 'ফরেন এইড'-এর বঙ্গানুবাদ বৈদেশিক সাহায্য হওয়া যথার্থ নয়। তথাপি প্রচলিত ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে চলার স্বার্থে এ প্রবন্ধে আমরা ফরেন এইড-এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যকে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছি। আলোচনার সুবিধের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে ফরেন এইড বলতে আমরা "বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য" টার্মটি ব্যবহার করেছি।

ধনস্ফীতির; বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথে সম্পর্কিত আমদানি নির্ভরতার সাথে এলিট শ্রেণীর চলতি ভোগ-বৃদ্ধি সাযুজ্যপূর্ণ, ঐ আমদানি কাঠামোর সাথে ব্যাপক দরিদ্রগোষ্ঠির চলতি ভোগের সম্পর্ক ক্ষীণ; এবং বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথে ক্রমবর্ধমান হারে কালো টাকার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সরাসরি সম্পর্কিত।

তৃতীয়তঃ দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে জনগণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ (basic needs) পূরণের ক্ষেত্রে (যা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব) বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা নগণ্য। দেখানো হয়েছে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য নির্ভরতার সাথে জনকল্যাণের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান ধনস্ফীতির; বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথে সম্পর্কিত আমদানি নির্ভরতার সাথে এলিট শ্রেণীর চলতি ভোগ-বৃদ্ধি সাযুজ্যপূর্ণ, ঐ আমদানি কাঠামোর সাথে ব্যাপক দরিদ্রগোষ্ঠির চলতি ভোগের সম্পর্ক ক্ষীণ; এবং বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথে ক্রমবর্ধমান হারে কালো টাকার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সরাসরি সম্পর্কিত।

চতুর্থতঃ বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কতখানি প্রয়োজন- এ প্রশ্নের উত্তরের সাথে সম্পর্কিত সবচে' গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হল সম্ভবতঃ ঐ ঋণ-সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা- এ বিষয়টি। এ মর্মে কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প বিশ্লেষণ করে আমরা কিছু হিসেব পত্তর দাঁড় করিয়েছি (যা আনুমানিক তবে যথেষ্ট মাত্রায় প্রবণতা নির্দেশক) যেখানে দেখা যাচ্ছে যে গত তিন দশকে প্রবাহিত বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের মাত্র ২৫ ভাগ পৌঁছেছে তাদের কাছে যাদের উদ্দেশ্যে ঐ সাহায্য এসেছে, আর ৭৫ ভাগ বিভিন্নভাবে লুটপাট হয়েছে (২৫% বিদেশিরা, ৩০% দেশের আমলা, রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক, ঠিকাদাররা ও ২০% শহর ও গ্রামের উচ্চবিত্তরা)। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের লুটপাট প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে অর্থনীতিকে দুবৃত্তায়িত করেছে, এবং অর্থনৈতিক দুবৃত্তায়ন স্থায়ীকরণে রাজনীতিকেও দুবৃত্তায়িত হতে হয়েছে। দুর্নীতি, ঘুষ, সন্ত্রাস, কালোটাকা, ঋণখেলাপি সংস্কৃতি এসবই উক্ত দুবৃত্তায়নের অনুষঙ্গ মাত্র।

পঞ্চমতঃ বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের (বিশেষ করে প্রকল্প ঋণের) চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য প্রতিকূল এবং যা আমাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে - এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে উক্ত সাহায্য প্রবাহ মূলতঃ দাতাগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনীতিতে আমরা বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ওপর যতটুকু নির্ভরশীল সেখানে 'উন্নয়ন' কোনো লক্ষ্য নয়- উপলক্ষ মাত্র। এইড কনসোর্টিয়াম, বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কসহ অন্যান্য দাতাগোষ্ঠির গত দুই দশকের ঋণ প্রদান কর্মসূচির বিশ্লেষণ সেটাই প্রমাণ করে।

সবশেষে, গত তিন দশকে আমাদের দেশে যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহিত হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের কার্যকারণ বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনকল্যাণকর কোনো ভূমিকা রাখেনি, উল্টো সেটা বিদেশি-দেশি সুনির্দিষ্ট স্বার্থ-গোষ্ঠির ধনস্ফীতির মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির দুবৃত্তায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে/করছে। যে প্রক্রিয়ায় ও যে সব শর্তে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য আমাদের দেশে প্রবাহিত হয়েছে তার অভিঘাত ঐ ঋণ-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে কঠোর প্রশ্নের সম্মুখীন করে- এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই। আর গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা এমনটি হলে ভবিষ্যতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে কি'না সে বিষয়ে জাতীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যঃ দুটো তত্ত্বীয় উপসিদ্ধান্ত ও বাস্তবতা

সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক ঋণ-সাহয্যের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুটো উপসিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে:

প্রথম উপসিদ্ধান্ত: বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহ বিনিয়োগের হার প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে ।

দ্বিতীয় উপসিদ্ধান্ত: বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য পরোক্ষভাবে দেশজ সঞ্চয় হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি করে, ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় ।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের অব্যাহত প্রবাহ যে একটি দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার বৃদ্ধিতে সরাসরি প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে এ কথা নিঃশর্ত নয় ।[৩] বেশ কিছু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে (বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের) বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রভাব বিশ্লেষণে অনেকেই দেখিয়েছেন যে:

১। নীট বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের বৃদ্ধি অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ হার বাড়াবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই ।

২। যেসব দেশের ক্ষেত্রে নীট বৈদেশিক বৃদ্ধির অন্ত:প্রবাহ বিনিয়োগ হার বাড়িয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে ।

৩। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাসের হার বিনিয়োগ হার বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে, যার কারণে প্রবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে ।

৪। যেহেতু দক্ষতা বৃদ্ধি ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নয়, সেহেতু দৈব ব্যতীত এ জাতীয় সাহায্য দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়াবে এমন সম্ভাবনা কম ।

৫। বৈদেশিক সাহায্য বৃহৎ প্রকল্প পছন্দ করে যা দাতাদের 'মহানুভবতার' নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয় – সুতরাং, জাতীয় পছন্দ-অপছন্দের সাথে অথবা অগ্রাধিকারের সাথে তার সম্পর্ক নেই ।

৬। বন্ধনযুক্ত ও শর্ত-কন্টকিত সাহায্যের কারণে কৃত্রিমভাবে প্রকল্পের মূলধন বৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য ।

৭। বৈদেশিক সাহায্যে দেশজ সঞ্চয় হার বাড়ানোর পরিবর্তে তাকে কমিয়ে দেয় (মাধ্যমসমূহ হল বেসরকারি ভোগ, অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা, [৪]সরকারি ভোগ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি) এবং বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি যত বেশি হয় – দেশজ সঞ্চয় হার হ্রাসের গতিও তত তীব্র হয় ।

৮। বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস করার বদলে তা আরো ঘনীভূত করেছে ।

বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যঃ
পরিমাণ, কাঠামোগত রূপান্তর ও ক্রমবর্ধিষ্ণু দায়ভার

পাকিস্তান আমলে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য যা পাওয়া যেতো তার অনধিক ২০% তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ব্যবহৃত হত । বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এ দেশের অর্থনীতিতে কোনো অর্থেই পুনরুজ্জীবকের ভূমিকা পালন

[৩] উন্নয়ন বলতে প্রায়শই যা বুঝানো হয়ে থাকে এবং যে কোনো অর্থ খরচ করাকেই যেভাবে 'বিনিয়োগ' বলা হয়ে থাকে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ । 'উন্নয়ন' ও উন্নয়ন নিমিত্ত ব্যয় (বিনিয়োগ) সঠিক পরিচয়ে আবির্ভূত হওয়া জরুরি । অন্যথায় সরকারি পরিসংখ্যানে উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট চলক সম্পর্কে যে সকল তথ্য পরিবেশিত হয় তার ভিত্তিতে প্রদেয় বিশ্লেষণ বিভিন্ন মাত্রায় ভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক । এ বিষয়ে আমাদের রপ্তানী আয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত ইদানিংকালের বিতর্কটা প্রণিধানযোগ্য ।

[৪] যে দেশের মিলিটারি বাজেট যতবেশি সে দেশ সাহায্যদাতাদের ততবেশি পছন্দ– দ্বিপাক্ষিক দাতাদের ক্ষেত্রে এ ধরণের সম্পর্ক স্থাপন অমূলক নয় । যেমন মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে (১৯৯০ সনের তথ্য) মিলিটারী বাজেটে যে সব দেশ অত্যুচ্চ ব্যয় করেছে (জিডিপি'র ৪%-র বেশি) তারা মধ্যস্তরের মিলিটারী বাজেটধারী দেশের (জিডিপি-র ২-৪%) তুলনায় মাথপিছু ৮০ ভাগ বেশি এবং স্বল্পমাত্রার মিলিটারী বাজেটধারী দেশের (জিডিপি-র ২%-এর কম) কম) তুলনায় মাথাপিছু ৩০ ভাগ বেশি ঋণ সাহায্য পেয়েছে । ১৯৮৯-৯০ সনে মার্কিন দ্বিপাক্ষিক ঋণ-সাহায্যের অর্ধেকই পেয়েছিল অত্যুচ্চ মিলিটারী বাজেটধারী পাঁচটি দেশ– ইসরায়েল, মিসর, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, ও এর সালভাদর । এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ ভিন্নধর্মী নয়, কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে গত ২০ বছরে যখন মিলিটারী বাজেট জিডিপি-র ৭% থেকে ১৫%-এ উন্নিত হয়েছে তখন তারা কাঠামোগত সমন্বয়ের নামে মিলিটারী বাজেট সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না করে সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) সরকারি ব্যয় বরাদ্দ কমাতে বাধ্য করেছে (মাহবুবুল হক ১৯৯৫: ১৪৮-১৪৯) ।

করেনি। উল্টো সেটা কাজে লেগেছিল পাকিস্তানী ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতাবলয় শক্তিশালী করে নয়া ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তর করতে। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটি কারণ যার ফলে স্বাধীনতাত্তোর কালের সরকার পাকিস্তান আমলের বৈদেশিক ধার-দেনার দায়ভার গ্রহণে অস্বীকার করেছিল। অবশ্য পরবর্তীতে ঐ বোঝা বহন না করে উপায় ছিল না।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বছরে আমরা সরকারিভাবে প্রায় ৩৪৭৬ কোটি ডলার (প্রায় ১৮০,০০০ কোটি টাকা) বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান পেয়েছি (সারণি-২০)। তা ছাড়া গত দশ বছরে বেসরকারি স্বেচছাসেবী সংস্থাদের কাছে বৈদেশিক অনুদান এসেছে ৭৫৬৭ কোটি টাকা (সারণি-২১)[৫]। মাথাপিছু ঋণের দায়ভার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে - ১৯৭৩/৭৪ সনের ৬.৬ ডলার থেকে ১৯৯৮/৯৯ সনে প্রায় ১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬ ডলারে। ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে যেখানে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার সেটা ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৪ কোটি ডলারে, অর্থাৎ তিরিশ বছরে প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে গত প্রায় তিরিশ বছরে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহে কিছু কাঠামোগত রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য দিকসমূহ নিরূপঃ

১। ঋণ-অনুদান কাঠামোতে পরিবর্তনঃ গত তিন দশকের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৫২ শতাংশ ঋণ ও ৪৮ শতাংশ অনুদান। তুলনামূলক হিসেবে উত্তরোত্তর ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি ও অনুদানের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। মোট প্রাপ্তিতে যেখানে ১৯৭১/৭২ সনে ঋণের অংশ ছিল আনুমানিক ১০ ভাগ সেটা ১৯৯৮/৯৯ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দাতা গোষ্ঠি বৈদেশিক সাহায্যের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুদান দিয়ে শুরু করলেও উত্তরোত্তর আমাদেরকে অধিকহারে ঋণের চক্রে আবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয় উত্তরোত্তর ঐ ঋণজাল হয়েছে অধিকতর শর্ত-জালের ঋণ (tied loan)। আর শর্ত-জালের ঋণ আমাদের দেশে নির্ভরশীল ও ভাড়াটে অর্থনীতির একটা কাঠামো সৃষ্টি করেছে বলা যায়।

২। ঋণ-অনুদানে খাতওয়ারি পরিবর্তনঃ বেশ দীর্ঘকালব্যাপী মোট বৈদেশিক সাহায্যে প্রকল্প খাতের বিপরীতে খাদ্য ও পণ্যখাতের আধিক্য থাকলেও উত্তরোত্তর প্রকল্প খাতই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, যেমন ১৯৭২/৭৩ সনে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৫ শতাংশই ছিল খাদ্য (৩৩%) ও পণ্য খাতে (৫২%), পরবর্তীতে এ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে (সারণি-২২)। গত পনেরো বছরের প্রবণতা সেটাই নির্দেশ করে। যেমন ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৩ ভাগই এসেছে প্রকল্প খাতে। আর প্রকল্প খাতে শর্ত-জালের বেষ্টনী যত শক্তভাবে কাজ করে অন্য কিছুতেই সেটা সম্ভব হয় না।

৩। সাহায্যের উৎসগত পরিবর্তনঃ উৎসগত দিক থেকে দ্বিপাক্ষিক দাতার (bilateral donors) বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা (multilateral donors) প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিপাক্ষিক দাতার বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা গোষ্ঠি অপেক্ষাকৃত অধিক অনড় ও পারঙ্গম। আর তাই দেখা যাচ্ছে যে উল্লিখিত শর্ত-জালের কর্মকৌশল অধিকতর ফলপ্রদ করার স্বার্থে উত্তরোত্তর দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪-৮৪ কাল-পর্বে বহুপক্ষীয় দাতা সংস্থা মোট সাহায্যের আনুমানিক ৩০ ভাগের উৎস হিসেবে কাজ করতো, আর এখন এটা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ ভাগে

[৫] বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ কি পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান পেয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত সঠিক তথ্য অন্তত সরকারি পরিসংখ্যানে নেই। সেইসাথে উন্নয়ন সহযোগী, প্রাইভেট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রাইভেট স্বেচ্ছসেবী উন্নয়ন সংস্থা অথবা এক কথায় এনজিও'রা বৈদেশিক ঋণ-অনুদান (ফরেন এইড) ব্যবহার করে কি পরিমাণ মানব উন্নয়ন ঘটাতো সক্ষম হয়েছেন অথবা মানব বঞ্চনা কতটুকু নির্মূল করেছেন এ বিষয়েও পূর্ণ তথ্য নেই বললেই চলে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মানব উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের এনজিও-র ভুমিকা সমান নয়; অনুদানের যে অংশটি প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছায় সেটাও বিভিন্ন এনজিও-র ক্ষেত্রে ভিন্ন। গবেষণায় দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দেশজ এনজিও-রা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও বিদেশি এনজিওদের তুলনায় অধিকতর ফলপ্রদ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে বিদেশি এনজিও এশিয়া ফাইন্ডেশন তার স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ১০০ ডলার বেদেশিক অনুদান পেলে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছায় সর্বোচ্চ ৪৪ ডলার যার মধ্যে ১৮ ডলার সরাসরি স্বাস্থ্য-সেবা কাঠামো সৃষ্টি খাতের ভোক্তা পেয়ে থাকেন (fiedler et.al., 1996).

(সারণি-২২)। বহুপাক্ষিক দাতা গোষ্ঠির মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কই প্রধান। ১৯৯৯ সনের ৩০ জুনের হিসেবে আমাদের ঋণ ভারের ৬৮ ভাগের জন্য আমরা বহুপক্ষীয় দাতা গোষ্ঠি আইডিএ (৪৩%) ও এডিবি (২৫%)-র কাছে দায়বদ্ধ।

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আমাদের ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি করেছে। ক্রমবর্ধমান ঋণের পরিমাণ, গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়া এবং প্রতিকূল বিনিময় হার ক্রমান্বয়ে আমাদের পরিশোধিতব্য ঋণের (debt service payment) বোঝা বৃদ্ধি করছে। যেমন, ১৯৭২/৭৩ সনে আমাদের মোট অপরিশোধিত ঋণের বোঝা ছিল ৬.৫ কোটি ডলার, ১৯৯৮/৯৯ সনে তার পরিমাণ ১৮৩৫ কোটি ডলার; ঋণের কিস্তি ও সুদ প্রদানের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪-এ ২ কোটি ডলার থেকে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৭ কোটি ডলারে। গত প্রায় তিন দশকে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮/৯৯) ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে ৬১৮ কোটি ডলার (প্রায় ৬৪% মূল কিস্তি বাবদ ও ৩৬% সুদ বাবদ)। ১৯৯৮/৯৯ সনে ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সেটা আমাদের মোট বাণিজ্যিক রপ্তানির (merchandise export) ১৪.৫%, মোট পণ্য ও সেবা রপ্তানী আয়ের (বিদেশ থেকে শ্রমশক্তি রপ্তানীর আয় সহ) ১০% এবং জিডিপি-র ২.১%। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী (ঋণের কিস্তি ও সুদের মোট পরিমাণের বর্তমান মূল্যর নিরিখে) বাংলাদেশ "চরম ঋণগ্রস্ত" দেশদের মধ্যে অন্যতম।

সারণি-২০: বাংলাদেশে মোট বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান ঃ ১৯৭১/৭২ - ১৯৯৮/৯৯
(খাদ্য, পণ্য ও প্রকল্প খাতে প্রদেয়)

(কোটি ডলারে)

খাত	ঋণ	অনুদান	মোট	(%)
খাদ্য	৭৬.৩	৫০৬.৯	৫৮৩.২	(১৬.৮)
পণ্য	৫২১.৫	৪৮৭.৪	১০০৮.৯	(২৯.০)
প্রকল্প	১২০২.৫	৬৮১.১	১৮৮৩.৬	(৫৪.২)
মোট	১৮০০.৩	১৬৭৫.৪	৩৪৭৫.৭	১০০.০
শতকরা	৫১.৮	৪৮.২		

নোটঃ ইআরডি কর্তৃক প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০০) "Flow of External Resources into Bangladesh" (as of June 30, 1999)-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত। হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়নিঃ আই এম এফ ক্রেডিট ও কিছু বিশেষায়িত খাতের ধার/কর্জ, যার মধ্যে আছে খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, দেশরক্ষা বাহিনী, এনজিও ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত।

সারণি ২১: বাংলাদেশে এনজিও-দের উদ্দেশ্যে বিদেশি অনুদান প্রবাহঃ ১৯৯০-১৯৯৯

সময়কাল (অর্থ বছর)	মোট এনজিও	মোট প্রকল্প	কোটি টাকা	কোটি ডলার
১৯৮৯-৯০	৩৮২	৮	২১.৭	০.৫
১৯৯০-৯১	৪৯৪	৪৬৪	৪২৬.৪	১০.৬
১৯৯১-৯২	৫৩৪	৫৪৯	৪৮৬.৫	১২.১
১৯৯২-৯৩	৭২৫	৬২৬	৭৮২.৮	১৯.৫
১৯৯৩-৯৪	৮০৭	৫৮১	৬৮৪.০	১৭.১
১৯৯৪-৯৫	৯১৯	৫৭৯	৮৩৮.০	২০.৯
১৯৯৫-৯৬	১০১৪	৭০২	১০৩৭.২	২৫.৯
১৯৯৬-৯৭	১১৩২	৭৪৬	১০৪১.০	২৫.০
১৯৯৭-৯৮	১২৩৯	৭০৫	৯৩৬.০	২০.৬
১৯৯৮-৯৯	১৩৬১	১০৪৫	১৩১২.৮	২৭.৩
মোট			৭৫৬৬.৭	১৭৯.৯

উৎসঃ এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর অফিস (১ ডলার = ৪৫.২৫ টাকা)

সারণি ২২: বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-অনুদান ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশকসমূহের গতিপ্রকৃতিঃ ১৯৭৪/৭৫ - ১৯৯৮-৯৯

	নির্দেশক	১৯৭৪/৭৫	৭৫/৭৬	৭৬/৭৭	৭৭/৭৮	৭৮/৭৯	৭৯/৮০	৮০/৮১	৮১/৮২	৮২/৮৩	৮৩/৮৪	৮৪/৮৫	৮৫/৮৬	৮৬/৮৭	৮৭/৮৮	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯
১।	জনসংখ্যা (কোটি)				৮.৪	৮.৬	৮.৭	৯.০	৯.২	৯.৪	৯.৭	৯.৯	১০.২	১০.৩	১০.৫	১০.৯	১১.০	১১.১	১১.৩	১১.৩	১১.৬	১২.০	১২.২	১২.৪	১২.৭	১২.৮
২।	বর্তমান বাজার মূল্যে				৮৬১.৭	৯৬৫.২	১,২৭৮.১	১,৪২৭.৬	১,৩২৫.৭	১,২১৩.৯	১,৪০০.৮	১,৬১১.২	১,৫৫৯.১	১,৭৫৯.৮	১,৯১০.৮	২,০৬১.২	২,২১২.৯	২,৩৩৭.২	২,৩৭৭	২,৪২২	২,৫৭৬	২,৯১১	৩১৮৫.৬	৩২৮৫.৭	৩৪০৬.২	৩৬৩৯.৪
	জিডিপি (কোটি ডলারে)																									
৩।	সরকারি আয় (কোটি ডলারে)				৮৫.৮	১০৫.৪	১১২.২	১৪৫.৪	১২২.৮	১১১.২	১১১.৮	১৩৫.৯	১৩৮.১	১৫২.৮	১৬৮.৩	১৮০.৬	২০৩.৪	২২৩.৪	২৪৯.৫	২৮২.৬	৩১২.৩	৩৫২.৬	৩৬৬.১	৪০১.৫	৪২১.৮	৪০৯.৯
	রাজস্ব আয় (কোটি ডলারে)				৬৮.৫	৮২.৪	৯০.৯	১০৮.৮	৯৮.৪	৯১.০	৯৬.৫	১০৯.৬	১০৮.০	১২৫.৮	১৩৯.৭	১৫৩.০	১৭৩.৫	১৭৮.৮	২০৩.০	২৩১.৪	২৫২.২	২৮৫.২	২৯৬.৮	৩২৯.৬	৩৫২.০	৩২৯.৯
৪।	রাজস্ব আয়ঃ জিডিপি'র %				৮.০	৮.৫	৭.১	৭.৬	৭.৪	৭.৫	৬.৯	৬.৮	৬.৯	৭.২	৭.৩	৭.৪	৭.৮	৭.৭	৮.৫	৯.৬	৯.৮	৯.০	৯.৩	১০	১০	৯.১
৫।	মোট ব্যয় (কোটি ডলার)				১৪১.৮	১৭৯.৩	২৩৭.১	২৩৫.৭	২২৮.২	২১৫.৭	২৩৭.৬	২৪৭.৯	২৫১.৩	২৭৬.৪	৩০০.২	৩৩৬.৪	৩৮৯.০	৩৭৬.৪	৩৯৪.৫	৪৪২.৫	৪২১.৬	৫১৮.৮	৫৩০.৮	৫৫২.১	৫৯৪.৬	৬০৯.১
৬।	উন্নয়ন ব্যয় (কোটি ডলার)				৭৯.৬	১০৬.৮	১৫০.৪	১৪৫.০	১৩৫.৮	১২৫.৩	১৩৭.৪	১৩২.২	১৩৭.০	১৪৭.৩	১৪৮.৮	১৪৩.৬	১৯২.৬	১৬৬.৭	১৬৫.৩	১৮৭.৪	১৮৬.১	২৬১.৭	২৪৫.১	২৫৮.৬	২৪২.৮	২৬০.৩
৭।	রাজস্ব ব্যয় (কোটি ডলার)				৬২.২	৭২.৫	৮৬.৭	৯০.৭	৯২.৪	৯০.৪	১০০.২	১১২.৭	১১৪.৩	১২৯.১	১৫১.৪	১৯২.৮	২০২.২	২০৪.৭	২০৭.১	২১৮.৪	২৩৫.৪	২৫৭.১	২৮৫.৬	২৯৭.৬	৩৫১.৮	৩৪৮.৮
৮।	বৈদেশিক প্রাপ্ত সাহায্য (কোটি ডলার)				৮৩.৪	১০৩.০	১২২.৩	১১৪.৬	১২৪.০	১১৭.৭	১২৬.৮	১২৬.৯	১৩০.৬	১৫৯.৫	১৬৪.০	১৬৪.৮	১৮১.০	১৭৩.৩	১৬১.২	১৬৭.৫	১৫৫.৯	১৭৩.৯	১৪৪.৪	১৪৮.১	১২৫.১	১৫৩.৬
৯।	মোট সাহায্য পরিশোধ	১০.১	৭.৪	১২.০	১০.৯	১৪.৫	২২.০	২৪.০	৩৯.৯	৪১.৬	৩৫.৭	৪৭.৬	৫১.৯	৬০.০	৫৩.৭	৪৭.৩	৫৭.০	৫৮.৬	৫২.৬	৫০.৬	৫১.২	৫৫.২	৫৬.১	৬১.১	৫৭.৮	৭৭.৩
	(কোটি ডলার) (TDS)																									
১০।	নীট ট্রান্সফার (কোটি ডলার)				৭৬.৯	৮৪.১	১১.৫	১০৬.১	১১৪.৮	১০৪.১	১১৪.০	১১০.০	১১২.২	১৫৯.৫	১৬৪.০	১৬৬.৮	১৮০.৯	১৭৩.৩	১৬১.২	১৬৭.৫	১৫৫.৯	১৭৩.৯	১৪৪.৪	১৪৮.২	১২৫.১	১৫৩.৬
১১।	অপরিশোধিত ঋণ (কোটি ডলার)				২৭৮.৩	৩১৯.৩	৩৪০.০	৪৩৮.৩	৪৯৫.৯	৫৪৫.২	৫৯৪.১	৬২৮.১	৭৪৩.৮	৮৩৬.৪	৯৪৭.৩	৯৮৭.৯	১,০৬০.৯	১,১৪৭.০	১,২১১.৭	১,২৪২.৪	১,৫৩৭.৩	১,৬৭৬.৭	১৫২০.৩	১৫০২.৫	১৪০৩.৩	১৪৮৪.৩
১২।	ব্যক্তিগত ট্রান্সফার (কোটি ডলার)				১১.৩	১৪.৩	২৪.৯	৩৭.৯	৪২.৪	৬২.৮	৬২.৭	৪৭.৭	৫৮.৬	৭৩.১	৭৮.৮	৮৩.৬	৮০.২	৮৪.৬	৯৭.৫	১০৬.৭	১২৪.৭	১৪২.৬	১৪৭.৫	১৭৭.০	১৭৭.০	১৯৭.৫
১৩।	রপ্তানী বাণিজ্যিক (কোটি ডলার)				৪৯.৯	৫৮.৬	৭৪.৩	৮২.১	৭২.৫	৭৮.২	৮২.২	৯৭.১	৯০.৯	১০০.০	১১৮.৬	১২৮.১	১৫২.৪	১৬৬.৯	১১০.৪	২৩৮.৩	২৫৩.৪	৩৪৭.৩	৩৮৮.২	৪৪২.৭	৫১৭.২	৫৩২.৪
১৪।	রপ্তানী- পণ্য ও সেবা																									
	(XGS) (কোটি ডলার)																									
১৫।	আমদানী (C&F) (কোটি ডলার)				১৪০.৯	১৬৪.১	২৪৩.৬	২৫৯.৩	২৬১.০	২৩০.৭	২৩৫.৩	২৬৪.৭	২৩৬.৪	২৬২.০	২৯৮.৬	৩৩৭.৫	৩৭৫.৯	৩৪৭.০	৩৪৬.৩	৪০৭.১	৪১৯.১	৫৮৩.৪	৬৮৮.০	৭১৬.২	৭৫২.৪	৮০১.৮
১৬।	বর্ষশেষ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ				২৬.৮	৩৯.৬	২৬.২	২৭.৭	১৩.৫	৩৬.৯	৫৫.৪	৪২.৬	৪৮.২	৭০.৯	৮৪.৫	৯০.৭	৫২.৩	৮৮.০	১৬১.২	২১২.১	২৭৬.৫	৩০৭.০	২০৩.৯	১৭১.৯	১৭৩.৯	১৫২.৩
	(কোটি ডলার)																									
১৭।	চলতি একাউন্ট ঘাটতি		৩৭.২	৪৩.৫	৭৬.৪	৮০.৯	১৩৭.৯	১৩৬.৮	১৫৩.৭	১০৪.১	১০১.২	১৩১.৪	১০৫.৫	১১২.২	১১৫.৬	১৪০.৭	১৫৭.৯	৯৮.১	৬০.৫	৬১.৮	৪২.০	১০৩.০	১৬৩.৭	৯০.৯	৫২.০	৩৯.৪
	(BoP) (কোটি ডলার)																									
১৮।	TDS / XGS (%)	২০.৮	১৫.৬	২১.৯	১৫.৩	১৬.৮	১৭.৬	১৬.২	২৮.৮	২৫.৫	২১.০	২৭.৮	৩০.১	৩০.৬	২৪.০	১৯.৩	২০.৯	২০.৩	১৫.৯	১৩.৭	১১.৯	১০.১	৯.৫	৯.২	৭.৭	১০.০
১৯।	TDS / GDP (%)	০.৭	১.০	১.৭	১.৩	১.৫	১.৭	১.৭	৩.০	৩.৪	২.৫	৩.০	৩.৩	৩.৪	২.৮	২.৩	২.৬	২.৫	২.২	২.০	২.০	১.৯	১.৮	১.৯	১.৭	২.১
২০।	Interest / XGS (%)	৩.৬	৬.২	৭.৭	৬.৫	৬.২	৪.৪	৩.৭	৭.০	৬.০	৬.২	৬.৯	৭.৮	৬.৯	৭.৭	৭.১	৬.৭	৫.৫	৪.৮	৪.২	৩.৬	২.৮	২.৮	২.৪	২.০	২.৪
২১।	Debt / XGS (%)	২০০.৪	৩৩২.০	৩৩১.৮	৩৯২.০	৩৬৮.৮	২৭২.৯	২৯৭.০	৩৫৮.১	৩৩৪.৭	৩৫০.১	৩৬৭.১	৪৩১.৫	৪২৭.২	৪২৪.২	৪০৪.৪	৩৮৮.৫	৪৩৯.৫	৪০১.৯	৩৬৮.৪	৩৫৮.১	৩০৫.৪	২৫৬.৭	২২৬	১৮৭.২	১৯১.৮
২২।	Debt / GDP (%)	৭.০	২২.০	২৫.৫	৩২.৩	৩৩.১	২৬.৬	৩০.৭	৩৭.৪	৪৪.৯	৪২.৪	৩৯.০	৪৭.৭	৪৭.৫	৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.৯	৫৪.৪	৫৬.১	৫৪.৯	৫৯.৩	৫৭.৬	৪৭.৬	৪৫.৭	৪১.২	৪০.৪
২৩।	চলতি একাউন্ট / GDP (%)	৭.৩	৫.২	৬.১	৮.৯	৮.৪	১০.৮	৯.৬	১১.৬	৮.৬	৭.২	৮.২	৬.৮	৬.৪	৬.০	৬.৮	৭.১	৪.২	২.৫	২.৫	১.৬	৩.৫	৫.১	২.৮	১.৫	১.১

তথ্য উৎসঃ Flow of External Resources in to Bangladesh (as on June 30, 1999) Economic Relations Division, Ministry of Finance (pp ১৯৯ - ২০০, ২০৪ - ২০৫) - এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধকার কর্তৃক প্রস্তুত।

সারণি ২৩: বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের কাঠামো / গঠনঃ ১৯৭১/৭২ - ১৯৯৮/৯৯

(কোটি ডলারে)

সময়কাল	মোট	খাত						ঋণ - অনুদান				উৎস			
		খাদ্য	%	পণ্য	%	প্রকল্প	%	ঋণ	%	অনুদান	%	বহুপাক্ষিক	%	দ্বিপাক্ষিক	%
১৯৭১-৭২	২৭.১	১৩.০	৪৭.৯	১৩.৮	৫০.৮	০.৪	১.৩	২.৬	৯.৫	২৪.৫	৯০.৫	৩.৯	১৪.৩	২৩.২	৮৫.৭
১৯৭২-৭৩	৫৫.২	১৮.৩	৩৩.১	২৮.৯	৫২.৪	৮.০	১৪.৫	৬.৫	১১.৮	৪৮.৬	৮৮.২	২০.২	৩৬.৭	৩৪.৯	৬৩.৩
১৯৭১-৭৩	৮২.৩	৩১.২	৩৮.০	৪২.৭	৫১.৯	৮.৪	১০.২	৯.৬	১১.০	৭৩.২	৮৯.০	২৪.১	২৯.৩	৫৮.১	৭০.৭
১৯৭৩-৭৪	৪৬.১	২২.৯	৪৯.৬	১০.৮	২৩.৪	১২.৪	২৭.০	২৪.৩	৫২.৬	২১.৭	৪৭.৪	৯.০	১৯.৪	৩৭.২	৮০.৬
১৯৭৪-৭৫	৯০.১	৩৮.২	৪২.৪	৩৭.৬	৪১.৭	১৪.৩	১৫.৯	৫২.৬	৫৮.৪	৩৭.৫	৪১.৬	২২.০	২৪.৫	৬৮.১	৭৫.৫
১৯৭৫-৭৬	৮০.১	৩১.৪	৩৯.২	৩৬.২	৪৫.২	১২.৬	১৫.৭	৫৬.৭	৭০.৮	২৩.৪	২৯.২	২২.৯	২৮.৬	৫৭.২	৭১.৪
১৯৭৬-৭৭	৫৩.৫	১২.২	২২.৭	২৫.৫	৪৭.৬	১৫.৯	২৯.৭	২৭.৯	৫২.২	২৫.৬	৪৭.৮	১৪.৭	২৭.৫	৩৮.৮	৭২.৫
১৯৭৭-৭৮	৮৩.৪	১৭.৮	২১.৩	৩৮.১	৪৫.৬	২৭.৬	৩৩.০	৪৪.১	৫২.৯	৩৯.৩	৪৭.১	১৮.২	২১.৮	৬৫.২	৭৮.২
১৯৭৩-৭৮	৩৫৩.১	১২২.৪	৩৪.৭	১৪৮.০	৪১.৯	৮২.৭	২৩.৪	২০৫.৬	৫৮.২	১৪৭.৬	৪১.৮	৮৬.৭	২৪.৬	২৬৬.৪	৭৫.৪
১৯৭৮-৭৯	১০৩.০	১৭.৯	১৭.৪	৪৮.৩	৪৬.৯	৩৬.৮	৩৫.৮	৫২.৮	৫১.৩	৫০.২	৪৮.৭	৩০.৪	২৯.৫	৭২.৬	৭০.৫
১৯৭৯-৮০	১২২.৩	৩৭.৫	৩০.৬	৩৭.৯	৩০.৯	৪৭.০	৩৮.৪	৫৭.২	৪৬.৮	৬৫.১	৫৩.২	৩৩.৪	২৭.৩	৮৯.০	৭২.৭
১৯৭৮-৮০	২২৫.৩	৫৫.৪	২৪.৬	৮৬.১	৩৮.২	৮৩.৮	৩৭.২	১১০.১	৪৮.৮	১১৫.৩	৫১.২	৬৩.৭	২৮.৩	১৬১.৬	৭১.৭
১৯৮০-৮১	১১৪.৬	১৯.৪	১৬.৯	৩৯.২	৩৪.২	৫৬.০	৪৮.৮	৫৫.৩	৪৮.২	৫৯.৪	৫১.৮	৩২.০	২৭.৯	৮২.৭	৭২.১
১৯৮১-৮২	১২৪.০	২৩.০	১৮.৬	৪২.০	৩৩.৯	৫৮.৯	৪৭.৫	৫৮.৬	৪৭.৩	৬৫.৪	৫২.৭	৩৯.৯	৩২.২	৮৪.৫	৬৭.৮
১৯৮২-৮৩	১১৭.৭	২৫.৬	২১.৭	৪৫.২	৩৮.৪	৪৭.০	৩৯.৯	৫৯.০	৫০.১	৫৮.৮	৪৯.৯	৩৮.৩	৩২.৫	৭৯.৪	৬৭.৫
১৯৮৩-৮৪	১২৬.৮	২৭.৬	২১.৮	৪৩.৯	৩৪.৬	৫৫.৩	৪৩.৬	৫৩.৫	৪২.১	৭৩.৪	৫৭.৯	৪৫.৩	৩৫.৭	৮১.২	৬৪.৩
১৯৮৪-৮৫	১২৬.৯	২৪.৭	১৯.৫	৪৩.২	৩৪.০	৫৯.১	৪৬.৫	৫৬.৬	৪৪.৬	৭০.৩	৫৫.৪	৫৪.৮	৪৩.২	৭২.১	৫৬.৮
১৯৮০-৮৫	৬১০.১	১২০.৩	১৯.৭	২১৩.৫	৩৫.০	২৭৬.৩	৪৫.৩	২৮২.৯	৪৬.৪	৩২৭.২	৫৩.৬	২১০.৩	৩৪.৫	৩৯৯.৮	৬৫.৫
১৯৮৫-৮৬	১৩০.৬	২০.৩	১৫.৫	৩৯.৩	৩০.১	৭১.০	৫৪.৪	৭৬.০	৫৮.২	৫৪.৬	৪১.৮	৬৮.০	৫২.১	৬২.৬	৪৭.৯
১৯৮৬-৮৭	১৫৯.৫	২২.৫	১৪.১	৪০.৩	২৫.২	৯৬.৭	৬০.৬	৯৩.৪	৫৮.৫	৬৬.২	৪১.৫	৫৪.১	৩৩.৯	১০৫.৪	৬৬.১
১৯৮৭-৮৮	১৬৪.০	৩০.১	১৮.৩	৫০.৯	৩১.১	৮৩.১	৫০.৬	৮১.৭	৪৯.৮	৮২.৪	৫০.২	৭৩.৬	৪৪.৯	৯০.৪	৫৫.১
১৯৮৮-৮৯	১৬৬.৯	২২.৭	১৩.৬	৫৩.৮	৩২.২	৯০.৪	৫৪.২	৯৯.৬	৫৯.৭	৬৭.৩	৪০.৩	৭৭.৪	৪৬.৪	৮৯.৪	৫৩.৬
১৯৮৯-৯০	১৮১.০	১৮.৮	১০.৪	৪৫.৭	২৫.২	১১৬.৫	৬৪.৪	১০৪.৪	৫৭.৭	৭৬.৬	৪২.৩	৮৯.৮	৪৯.৬	৯১.২	৫০.৪
১৯৮৫-৯০	৮০২.০	১১৪.৩	১৪.৩	২৩০.০	২৮.৭	৪৫৭.৭	৫৭.১	৪৫৫.০	৫৬.৭	৩৪৭.০	৪৩.৩	৩৬৩.০	৪৫.৩	৪৩৯.০	৫৪.৭
১৯৯০-৯১	১৭৩.৩	২৬.৯	১৫.৫	৪০.৮	২৩.৬	১০৫.৬	৬০.৯	৯০.১	৫২.০	৮৩.২	৪৮.০	১০৫.২	৬০.৭	৬৮.৭	৩৯.৩
১৯৯১-৯২	১৬১.২	২৪.১	১৫.০	৩৮.৬	২৪.০	৯৮.৪	৬১.১	৭৯.৪	৪৯.৩	৮১.৭	৫০.৭	৮৬.০	৫৩.৪	৭৫.২	৪৬.৬
১৯৯২-৯৩	১৬৭.৫	১২.১	৭.২	২৭.২	২২.২	১১৮.২	৭০.৬	৮৫.৭	৫১.১	৮১.৮	৪৮.৯	৭৫.৯	৪৫.৩	৯১.৬	৫৪.৭
১৯৯৩-৯৪	১৫৫.৯	১১.৮	৭.৬	৪৫.১	২৯.০	৯৯.০	৬৩.৫	৮৪.৯	৫৪.৪	৭১.০	৪৫.৬	৮২.৮	৫৩.১	৭৩.১	৪৬.৯
১৯৯৪-৯৫	১৭৩.৯	১৩.৭	৭.৯	৩৩.৩	১৯.১	১২৬.৯	৭৩.০	৮৪.৯	৪৮.৮	৮৯.০	৫১.২	৮২.১	৪৭.২	৯১.৮	৫২.৮
১৯৯৫-৯৬	১৪৪.৪	১৩.৮	৯.৬	২২.৯	১৫.৯	১০৭.৬	৭৪.৬	৭৬.৬	৫৩.১	৬৭.৬	৪৬.৯	৬৮.৭	৪৭.৬	৭৫.৭	৫২.৪
১৯৯০-৯৬	৯৭৬.১	১০২.৪	১০.৫	২১৮.০	২২.৩	৬৫৫.৭	৬৭.২	৫০১.৬	৫১.৪	৪৭৪.৫	৪৮.৬	৫০০.৭	৫১.৩	৪৭৫.৪	৪৮.৭
১৯৯৬-৯৭	১৪৮.১	১০.১	৬.৮	২৬.৩	১৭.৮	১১১.৭	৭৫.৪	৭৪.৫	৫০.৩	৭৩.৬	৪৯.৭	৭৬.৪	৫১.৬	৭১.৭	৪৮.৪
১৯৯৭-৯৮	১২৫.১	৯.৩	৭.৪	১২.০	৯.৬	১০৩.৯	৮৩.০	৭৪.৯	৫৯.৮	৫০.৩	৪০.২	৭৬.৩	৬১.০	৪৮.৯	৩৯.০
১৯৯৮-৯৯	১৫৩.৬	১৭.৭	১১.৫	৩২.৪	২১.১	১০৩.৫	৬৭.৪	৮৬.৭	৫৬.৪	৬৬.৯	৪৩.৬	৮৮.২	৫৭.৪	৬৫.৪	৪২.৬
১৯৯৬-৯৯	৪২৬.৯	৩৭.১	৮.৭	৩৮.৩	৯.০	৩১৯.১	৭৪.৮	২৩৬.০	৫৫.৩	১৯০.৮	৪৪.৭	২৪০.৯	৫৬.৪	১৮৬.০	৪৩.৬
মোট	৩৪৭৫.৭	৫৮৩.১	১৬.৮	৯৭৬.৫	২৮.১	১৮৮৩.৬	৫৪.২	১৮০০.২	৫১.৮	১৬৭৫.৫	৪৮.২	১৪৮৯.৪	৪২.৯	১৯৮৬.৩	৫৭.১

তথ্য উৎসঃ Flow of External Resource into Bangladesh, ERD, 2000

সারণি ২৪: বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের দায় দেনার বোঝাঃ ১৯৭১/৭২ - ১৯৯৮/৯৯

(কোটি ডলারে)

সাল	মোট প্রদেয়	ঋণ পরিশোধ			অপরিশোধিত ঋণ
		কিস্তি (মূল)	সুদ	মোট	
১৯৭১-৭২	২.৬	-	-	-	২.৬
১৯৭২-৭৩	৬.৫	-	-	-	৬.৫
১৯৭১-৭৩	৯.১	-	-	-	
১৯৭৩-৭৪	২৪.৩	০.৯	০.৯	১.৮	৩২.৪
১৯৭৪-৭৫	৫২.৬	৫.৮	১.৩	৭.১	৭৯.৩
১৯৭৫-৭৬	৫৬.৭	৩.৬	২.০	৫.৬	১৩২.৪
১৯৭৬-৭৭	২৭.৯	২.২	২.৮	৫.০	১৫৮.০
১৯৭৭-৭৮	৪৪.১	৩.৪	৩.১	৬.৫	২৫২.১
১৯৭৩-৭৮	২০৫.৬	১৫.৯	১০.০	২৫.৯	
১৯৭৮-৭৯	৫২.৮	৫.০	৩.৯	৮.৯	২৯৩.৪
১৯৭৯-৮০	৫৭.৩	৭.০	৪.২	১০.৮	৩০০.৯
১৯৭৮-৮০	১১০.১	১১.৬	৮.২	১৯.৭	
১৯৮০-৮১	৫৫.৩	৪.৪	৪.১	৮.৫	৩৫১.২
১৯৮১-৮২	৫৮.৬	৪.৫	৪.৭	৯.২	৩৯১.৬
১৯৮২-৮৩	৫৯.০	৮.৫	৫.১	১৩.৬	৪৩৫.২
১৯৮৩-৮৪	৫৩.৫	৭.১	৫.৮	১২.৮	৪৮১.০
১৯৮৪-৮৫	৫৬.৬	১০.৬	৬.৪	১৭.০	৫২৬.৮
১৯৮০-৮৫	২৮২.৯	৩৫.১	২৬.০	৬১.১	
১৯৮৫-৮৬	৭৬.০	১১.১	৭.৩	১৮.৪	৬১৪.০
১৯৮৬-৮৭	৯৩.৪	১৫.২	৮.১	২৩.৩	৭৫২.৮
১৯৮৭-৮৮	৮১.৭	১৬.৬	১২.৩	২৮.৯	৮৬৭.৫
১৯৮৮-৮৯	৯৯.৫	১৭.০	১২.৪	২৯.৪	৮৯২.৩
১৯৮৯-৯০	১০৪.৪	১৮.৬	১১.৬	৩০.২	৯৮০.৯
১৯৮৫-৯০	৪৫৫.০	৭৮.৪	৫১.৭	১৩০.১	
১৯৯০-৯১	৯৫.১	১৯.৭	১২.০	৩১.৭	১১৯৩.৪
১৯৯১-৯২	৭৯.৪	২১.০	১২.৭	৩৩.৭	১২৩৭.১
১৯৯২-৯৩	৮৫.৭	২৩.৯	১৩.৫	৩৭.৪	১২৭৪.৮
১৯৯৩-৯৪	৮৪.৯	২৬.৩	১৩.৯	৪০.২	১৪৫৬.২
১৯৯৪-৯৫	৮৪.৯	৩১.৪	১৫.৪	৪৬.৮	১৫৯৪.৭
১৯৯০-৯৫	৪২৯.৯	১২২.৩	৬৭.৬	১৮৯.৮	
১৯৯৫-৯৬	৭৬.৬	৩১.৭	১৫.৩	৪৬.৯	১৪৪৫.৪
১৯৯৬-৯৭	৭৪.৫	৩১.৬	১৪.৭	৪৬.৩	১৪৩৭.৩
১৯৯৭-৯৮	৭০.৬	৩০.৭	১৩.৭	৪৪.৪	১৩৪১.৮
১৯৯৮-৯৯	৮৬.৭	৩৭.০	১৬.৫	৫৩.৫	১৪৩৫.৪
১৯৯৫-৯৯	৩০৮.৪	১৩১.০	৬০.২	১৯১.২	
মোট	**১৮০১.০**	**৩৯৪.২**	**২২৩.৬**	**৬১৭.৮**	

তথ্য উৎসঃ Flow of External Resource in to Bangladesh, ERD, 2000

তিন দশকের বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যঃ মানব-উন্নয়ন কাঠামো সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে

সরকারিভাবে গত প্রায় তিন দশকে (১৯৭১-১৯৯৯) বাংলাদেশে মোট বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ১৮০,০০০ কোটি টাকা। এর বাইরে বেসরকারিভাবেও বিদেশি সাহায্য এসেছে - গত দশ বছরে ৭৫৬৭ কোটি টাকা। প্রশ্ন হ'ল- সরকারিভাবে আসা ঐ ১৮০,০০০ কোটি টাকার বিদেশি ঋণ-সাহায্য কার স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে? ঐ সাহায্য প্রয়োজনাতিরিক্ত কি না? কোন্ শ্রেণীর ভোগ-কাঠামোতে ঐ ঋণ-সাহায্যের অভিঘাতের স্বরূপ কেমন? ঋণ-সাহায্যের প্রবাহ ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে? এ বিষয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ইতোমধ্যে মূল্যবান কিছু গবেষণা করেছেন যা ১৯৮০-র দশকে ও ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত হয়েছে (Sobhan, R. 1990)। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক সময়ে ড. আতিউর রহমান, ড. তাজুল ইসলাম, সৈয়দ এম হাশেমি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পন্ন করেছেন।

গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহ যে বাংলাদেশে সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে এমনটি এখনও পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি। অর্থাৎ আমরা কোনো অর্থেই এখনও বলতে পারি না যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশের জনগণের জন্য পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত হল অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা। প্রকৃত অর্থে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের সাথে উল্লিখিত পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের সাথে ঐসব স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের সম্পর্কটি ঋণাত্মক। বাংলাদেশে মনুষ্য বঞ্চনার মাত্রাটি অন্ততঃ সেটাই নির্দেশ করে। মনুষ্য বঞ্চনার নিরঙ্কুশ মাত্রাসমূহ হতে পারে নিম্নরূপ: মোট ১৩ কোটি মানুষের ৬ কোটি দারিদ্র সীমার নীচে বাস, প্রায় ৯ কোটি মানুষের জন্য ভাল পয়ঃনিস্কাশন প্রণালীর সুযোগ নেই, প্রায় ৭ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত, ১ কোটির ঊর্ধ্বে শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে, প্রতিবছর ৩০ লক্ষ শিশু ডাক্তারী সহায়তা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করছে, ২০ লক্ষ শিশু জন্মগতভাবেই ওজন-স্বল্প, প্রায় ২ লক্ষ শিশু ৫ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুবরণ করে আর সমসংখ্যক শিশু পূর্ণ রোগ প্রতিষেধক টিকা পায় না, ২.৫ কোটি মানুষ কর্মহীন ও আধাকর্মহীন, প্রতিবছর যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের অর্ধেকই পাঁচ বছরের নীচের শিশু, প্রতি দিন অপুষ্টি সংশ্লিষ্ট কারণে ৬৫০ জন শিশুর মৃত্যু হয় ইত্যাদি।

মানব উন্নয়নের স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী ধারণার সাথে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের সম্পর্ক নির্ধারণে অর্থনীতিবিদদের অনেকেরই দ্বিমত থাকতে পারে। অনেকেই মনে করেন উক্ত ঋণ-সাহয্য প্রবাহ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে সাহায্য করার মাধ্যমে অন্ততঃ 'চুঁইয়ে পড়া' (tirickle down) উপযোগ সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে আমরা পরিসংখ্যানগত সহ-সম্পর্ক নির্ধারণে যা দেখি সেটা কোনোভাবেই এ ধারণা সমর্থন করে না। ১৯৭৮-৯৯-এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির (নির্ভরশীল চলক) সাথে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের (স্বাধীন চলক) সহসম্পর্ক সহগ হল ০.২৭, যা ১৯৮২-৯১-এ ০.১৯ ও ১৯৯১-৯৯-এ ০.৭১। অর্থাৎ জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের উপর নির্ভরশীল নয়। আর ৯০ এর দশকের ঋণাত্মক নির্ভরশীলতা সম্ভবত এটাই নির্দেশ করে যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা এত গভীর এবং সর্বব্যাপী যে বিপুল অঙ্কের সাহায্যপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) রচনা রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়ে। আসলে নির্ভরশীলতার এই মাত্রা যে আমাদের উন্নয়ন তাগিদ থেকেই উৎসারিত- এ কথা সত্য

নয়। বহু অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প "অদৃশ্য হাত মারফত" আমাদের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সম্ভবতঃ কারণটি এমন যে মধ্যবর্তী পর্যায়ে এমন কেউ রয়েছেন যিনি বা যারা এই সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে ব্যাপক সুবিধা আদায় করে থাকেন। এমনকি সাহায্য-নির্ভর প্রকল্পে এমন বেশ কিছু উপাদান সংযুক্ত হয় যেগুলো সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়- যেমন যানবাহন, অফিস সামগ্রী, পরামর্শদাতা এবং বিদেশ ভ্রমণ। যন্ত্র বা সরঞ্জামাদি বাছাই এবং প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বাধীনতা থাকে না। প্রকল্প চয়নের ক্ষেত্রে আমাদের স্বকীয় অগ্রাধিকারের বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব পায় না। প্রতিকূল শর্তাদি ও ক্রস-শর্তাদির বিষয়টি এখন সরকারিভাবেই স্বীকৃত (ERD, Flow of External Resources, 2000: xxi)। এখানে বলা সঙ্গত যে, বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রাপ্তির তিন দশক পরে ইদানিং আমরা যে অসমাপ্ত, পরিত্যক্ত এবং ক্ষতিকর প্রকল্পসমূহের কল্পনাতীত দায়ভার নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি সেটা 'সাহায্য' উদ্ভুত বিভিন্ন ধরণের নির্ভরশীলতা ও বাধ্যবাধকতার আওতায় উল্লিখিত 'অদৃশ্য হাতের" কারসাজি, প্রযুক্তি হস্তান্তরের নাকে পুরাতন-অকেজো ও বাতিল যন্ত্রপাতি ও (know how) পাচারের সক্রিয় প্রচেষ্টা, প্রকল্প চয়নে জাতীয় অগ্রাধিকারের গুরুত্বহীনতা– এসবেরই ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তার মতে বাংলাদেশে মৌলিক প্রয়োজনসমূহের চাহিদা এখন অবধি নিচু স্তরে রয়েছে। এই পটভূমিতে বিদ্যমান প্রযুক্তি এবং সম্পদ-ভিত্তির আওতায় বাংলাদেশ তার জনগণের জন্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। মাথাপিছু প্রতিদিন ১৬ আউন্স প্রয়োজনের ভিত্তিতে হিসেব করলে দুর্যোগমুক্ত বছরগুলোতে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থেকেছে এবং ২০ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। আমাদের কারখানাগুলোতে কাপড় উৎপাদন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং গোটা জনসংখ্যার ন্যূনতম বস্ত্র চাহিদা মেটানোর মতো বয়ন আমাদের হ্যান্ডলুমগুলোর রয়েছে। আমাদের ঔষধ কারখানাগুলো স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে সক্ষম। একইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সম্পদ জনগণের ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। গোটা জনসংখ্যার জন্যে টিনের ছাউনিযুক্ত কাঁচা বাড়ির সংস্থান করাও সম্ভব। সুতরাং, মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা বিরাজমান সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা থেকেই উদ্ভূত। আমরা খাদ্য উৎপাদন করতে পারি, কিন্তু উৎপাদিত খাদ্যশস্য সকলেই ভোগ করতে পারে এমন নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারি না। কেননা, এই নিশ্চয়তা নির্ভর করে জমির মালিকানা এবং মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের ওপর। কাজেই সকলের জন্যে মৌলিক প্রয়োজনগুলো নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে জমির পুনর্বণ্টন[৬] এবং আয়ের বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টি করা (রেহমান সোবহান, ১৯৯০)।

ভোগের ক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্য-নির্ভরতা- সেটাও মূলতঃ কাঠামোগত ব্যর্থতার পরিণতি। ভাল ফসল হয়েছে এমন বছরেও বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ প্রচেষ্টায় ১০০,০০০ টনের বেশি খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। ফলতঃ মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্যে আমাদের খাদ্য-সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। আমরা বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাহায্য কামনা করি, অথচ বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতারই পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। অধিকাংশ চালু বস্ত্র শিল্প লোকসান দিচ্ছে, তাঁতীরা তাঁত ছেড়ে দিচ্ছে এবং কোনো রকমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখছে।

---

[৬] বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা মেটানোর পূর্বশর্ত হিসেবে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য নয়, বরঞ্চ ভূমির পুনর্বণ্টন ও আয়ের বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টির যে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রসঙ্গ অধ্যাপক রেহমান সোবহান উত্থাপন করেছেন সেটি গুরুত্বপূর্ন। কেউ কেউ মনে করেন আমাদের দেশে কৃষি সংস্কারে (agrarian reform অর্থে) ভূমির পূনর্বণ্টনের কোনো ভূমিকা নেই। বিশদ বিশ্লেষণে না গিয়ে এ বক্তব্যের অসারতা নির্দেশের লক্ষ্যে দু'একটি তথ্য দেয়া যেতে পারে: বাংলাদেশের চিহ্নিত খাস জমির পরিমাণ ৩৩ লক্ষ একর (প্রায় ৮ লক্ষ একর কৃষি জমি, ১৭ লক্ষ একর অকৃষি জমি ও ৮ লক্ষ একর জল-জমি); এ ছাড়াও আছে অচিহ্নিত খাসজমি (যার পরিমাণ এখনও জানা নেই); চিহ্নিত খাস কৃষি-জমির ৭৫% এখনও ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন হয়নি, যার অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর মানুষ বেদখল করে আছে; ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনকৃত খাস জমির ৫৬%-এর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি (বারকাত, জামান, রায়হান, ২০০০; ৩-৬)।

আয় বণ্টনের বর্তমান অবস্থা চলতি ভোগের ক্ষেত্রে অধিকতর আমদানি-নির্ভর ধরন সৃষ্টি করছে। বিআইডিএস এর গবেষণায় দেখা গেছে যে শহুরে উচ্চ আয়ের লোকদের চলতি ভোগ বাজেটের ৪০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। সে তুলনায় গ্রামীণ দরিদ্রতম পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা মাত্র ১৪ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে আমরা দৈনন্দিন জীবনে খোলা চোখে যা দেখি এই হিসেবটি তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। চরম প্রান্তে ,শহুরে এলিটদের ভোগের ধরনটি অত্যন্ত আমদানি-ঘন। আমদানি-ঘন এই ভোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ভোগ্যপণ্য, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে । আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে সাহায্য কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্রধানত সমাজের উচচস্তরের ব্যক্তিরাই আত্মসাৎ করেন। বৈদেশিক সাহায্যকে আমদানিকৃত বিলাসবহুল ভোগের উদ্দেশ্যে চালিত করার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবীভাবেই ব্যাপক অপচয়ের উৎস হিসেবেই গণ্য করা উচিত। বৈদেশিক সাহায্যের অর্থে গঠিত উন্নয়নধর্মী অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ (DFI) বেসরকারি ঋণ গ্রহীতাদের সূত্রে অপচয়ের আর একটি উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ডিএফআই তহবিলসমুহ ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ জায়গা করে নেয় যেগুলো আবার এই শ্রেণীর ঋণ গ্রহীতাদের আমদানীকৃত ভোগের অর্থ যোগান দেয়। এ ধরনের তহবিল আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্য, এমনকি বিলাসবহুল বাসস্থান সামগ্রীর জন্যেও ব্যবহৃত হয়, যেগুলোর আমদানি-ঘনত্বের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। সবশেষে, বাংলাদেশে প্রতিবছর যে ৩০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকা সৃষ্টি হয়- বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সাথেও সেটার কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান (বারকাত আবুল, ১৯৯১)। সুতরাং সমগ্র বিদেশি ঋণ-সাহায্য কাঠামো আমাদের দেশে জনগণের স্বার্থ বিরোধী কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে - এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের দীর্ঘমেয়াদী অভিঘাত সমগ্র অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতিকে কালের ব্যাপ্তিতে মূলনীতিতে পরিণত করেছে।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা?

গত প্রায় তিন দশকে সরকারিভাবে প্রাপ্ত ১৮০,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা আমরা প্রায়শই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হই, কিন্তু সদুত্তর দিতে পারি না। এ বিষয়ে হিসেব নিকেশ দেয়া দুরূহ। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প দলিলের বিশ্লেষণ এবং বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কিছু অনুমান নির্ভর হিসেব করার প্রয়াস নেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন ধরণের অনুমান-নির্ভরতার কারণে হিসেবটি অত্যন্ত মোটা দাগের হলেও সেটা যথেষ্ট মাত্রায় মূল প্রবণতা নির্দেশ করতে সক্ষম। আমাদের হিসেব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশে আয়ের অসম বণ্টন ত্বরান্বিত করেছে এবং সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে দেশি ও বিদেশি কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হাতে। বড় দাগের হিসেবে (সারণি-২৫ দেখুন) দেখা যাচেছ যে, বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের তিন দশকে, বিদেশের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এজেন্ট ও পরামর্শকেরা সম্মিলিতভাবে মোট সাহায্যের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,০০০ কোটি টাকা লুটপাট করেছেন। দেশের ভিতরের আমলা-রাজনীতিবিদ (বখরা হিসেবে), কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক ও নির্মাণ ঠিকাদাররা হাতিয়ে নিয়েছেন মোট সাহায্যের ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪,০০০ কোটি টাকা। দেশের শহুরে ও গ্রামীণ ধনী ব্যক্তিরা (উচ্চ মধ্যবিত্তসহ) পেয়েছেন ২০ শতাংশ - ৩৬,০০০ কোটি টাকা। আর যাদের নামে মূলতঃ সাহায্য এসেছে ঐ গরীব শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছেন মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায় যে, গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের নামে ৪৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৩৫,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ধনস্ফীতির (লুটপাটের) একটি সংগঠিত পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। হতাশা উদ্রেগকারী এই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ মনে করেন বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে হয়ত বা শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত হবে এমন কিছু করা, যা দিয়ে ১৮০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৫,০০০ কোটি টাকা কিভাবে আরো ফলপ্রদ ব্যবহার করা যায় সে পদ্ধতি আবিষ্কার করা।

সারণি ২৫ঃ গত প্রায় তিন দশকে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮/৯৯) বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা

সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহ	মোট সুবিধার পরিমাণ (কোটি টাকা)	সুবিধার শতকরা হার
বিদেশি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী	২৩,৪০০	১৩
বিদেশি পরামর্শক	২১,৬০০	১২
দেশজ কমিশন এজেন্ট	১০,৮০০	৬
আমলা-রাজনীতিবিদ (বখরা)	১২,৬০০	৭
দেশজ পরামর্শক	৭,২০০	৪
নির্মাণ ঠিকাদার	২৩,৪০০	১৩
অন্যান্য ধনীব্যক্তি (শহর ও গ্রাম)	৩৬,০০০	২০
শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদিঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে নিয়োজিত শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গ্রামীণ ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি	৪৫,০০০	২৫
মোট	**১৮০,০০০**	**১০০**

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সুবিধাভোগীদের কোন গোষ্ঠি কিভাবে তা আত্মসাৎ করেন সে বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা উদ্ভুত চিন্তাউদ্রেককারী কিছু গবেষণা কাজ হয়েছে নব্বই এর শুরুর দিকে (রেহমান সোবহান ও অন্যান্য)। দেখা গেছে যে বৈদেশিক সাহায্যের একটি একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হয় দেশের বাইরে থেকে আনা পণ্য এবং পরিসেবার ব্যয় পরিশোধের জন্যে। এভাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এবং বিদেশি পরামর্শদাতার একটি দেশ-বহির্ভূত শ্রেণী বিদেশি সাহায্যের সরাসরি সুবিধাভোগী হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সেই সাথে আমাদের দেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সুবিধাভোগীর একটি শ্রেণী। বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর ব্যয়ের ওপর তাদের রয়েছে সরাসরি স্বার্থ। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় উদ্যোক্তা, বৈদেশিক সাহায্যের অর্থে আমদানিকৃত পণ্য ও পরিসেবার মধ্যস্বত্বভোগী বা কমিশন এজেন্ট, নির্মাণ ঠিকাদার, ডিএফআইসমূহ থেকে ঋণ গ্রহীতাগণ, বিদেশি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অবৈধ বখরাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আমলা) ও রাজনীতিবিদ। যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের এই সকল সরাসরি গ্রহীতা তাদের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করে দেশীয় বাজারে প্রাপ্ত নানা ধরনের পণ্য ও পরিসেবা ক্রয় বাবদ, এই সুবাদে সুবিধাভোগীদের একটি ব্যাপকতর নেটওয়ার্ক এই বৈদেশিক সাহায্য নেটওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাহায্যের ব্যাপ্তি এবং চুঁইয়ে পড়া উপকারের (trickle down effect) ফল হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তার প্রত্যক্ষ কোনো হিসেব নেই।

ইনডেন্টিং ব্যবসা, ডিএফআই ঋণ গ্রহীতা, বড় ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপরতলায় গুটিকতক সুবিধাভোগী বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য ব্যবস্থা থেকে অকল্পনীয় সম্পদ গড়ে তুলেছে। ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতাদের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য থেকে অর্জিত আয় বৈধ সার্ভিস থেকেই আসে। তবে কাজের বিধিবদ্ধতা এবং গুণগত মানের হেরফের করে এই শ্রেণীভুক্ত কতিপয় লোক ঋণ-সাহায্য খাত থেকে রেকর্ডবিহীন বখরা হাতিয়ে নেয়, যা অবশ্যই কালো টাকা।

ডিএফআই ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে অনেকে ডিএফআই প্রকল্পের জন্যে আমদানিকৃত সামগ্রীর অতিরিক্ত মূল্য উল্লেখ করেন, ঋণের পূর্ণ ব্যবহার করেন না অথবা দক্ষতার সাথে ঋণ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এ সব ঋণ গ্রহীতারা অপরিশোধযোগ্য বিপুল অঙ্ক পকেটস্থ করেন। বাংলাদেশে ২৫০ জন ঋণ খেলাপির কাছে জমে থাকা প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার সাথে বৈদেশিক ঋণের সম্পর্কটা অবশ্যই অতি ঘনিষ্ঠ (ঋণ খেলাপির সংজ্ঞার তারতম্য অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ও আত্মসাৎকৃত অর্থের ঘোষিত পরিমাণে হেরফের হয়ে থাকে)।

অনুরূপভাবে, ইনডেন্টরদের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা দালালী বাবদ প্রাপ্য এবং ওপর মহলের সাথে বিশেষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়ার সুবাদে কেউ কেউ (মূলতঃ আমলা-রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ী চক্র) ব্যাপক বখরা আদায় করে নেন। সেইসাথে ফাঁক-ফোকর বের করে এবং তোষামোদীর মাধ্যমে ইনডেন্টররা বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করে নেয়। এ ধরণের দালালীর ফলে প্রকল্প কিংবা সরবরাহ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়বহুল হয়ে যায়, তার দায় বহন করতে হয় দেশ এবং বৈদেশিক সাহায্যের সাধারণ সুবিধাভোগীদেরকেই। বৈদেশিক সাহায্যের লুটপাটকেন্দ্রিক একটি গোষ্ঠি ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে- যেখানে আছে ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনীতিবিদ। গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা উত্তরকালে যে সম্পদ ঘনীভূত হয়েছে তার হয়ত বা ৭৫ শতাংশের উৎস বিদেশি ঋণ-সাহায্য। শেষ পর্যন্ত বিদেশে পুঁজি পাচার, দৃষ্টিকটু ভোগ, জমি ও বাড়ী ক্রয়, উৎপাদন ক্ষমতার অপর্যাপ্ত ব্যবহার, উদ্বৃত্ত এবং পুনর্বিনিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিস্পৃহার, ডিএফআই এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের কাছে প্রভূত পরিমাণ অপরিশোধিত ঋণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অস্তিত্বের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেহেতু পরগাছাবৃত্তির বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য, আর সে কারণেই প্রচলিত বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখি না।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সুবিধা ও সুবিধাভোগীদের বিশ্লেষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐ ঋণ-সাহায্য প্রবাহের ফলে অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে যেটা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে সুদৃঢ় করছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কালো টাকা এই প্রক্রিয়ার সহজাত অনুষঙ্গ মাত্র। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিমাণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এমনতর গুণগত রূপান্তর ঘটিয়েছে যেখানে উল্লিখিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন থেকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করা সম্ভবত অসম্ভব।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যঃ দাতাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ

"বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে কার্যকরী"- আনুষ্ঠানিকভাবে একথা বলা হলেও ঐ ঋণ-সাহায্যে যে দাতাদের রাজনৈতিক এবং /অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রধান একথা আমাদের স্বাধীনতাত্তোর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে সু-স্বীকৃত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক দলিলে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে "বৈদেশিক সাহয্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে। ... বৈদেশিক সাহায্য দ্রুতহারে দায়-দেনার ভার বৃদ্ধি করে।...বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাজ অনিশ্চিত করে।... বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিমালা কার্যক্রম পরিচালনে বাধা সৃষ্টি করে" (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য যে মূলতঃ দাতাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যেই পরিচালিত বিষয়টি অনুধাবনের জন্য নিম্নলিখিত কিছু যুক্তি তথ্যের অবতারণা করা হ'ল ।

১ । রাজনৈতিক স্বার্থঃ ১৯৭৪ সালের ২৯শে মে মাত্র ৫৬ হাজার টন মজুদ খাদ্যশস্য নিয়ে যখন বাংলাদেশ বন্যার আশংকা করছিল ঠিক তখনই মার্কিন রাষ্ট্রদূত (ডেভিড বোস্টার) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে (ডঃ কামাল হোসেন) কিউবায় চটের বস্তা বিক্রি বন্ধ করার জন্য চাপ দেন । ঐ বছরই লিখিত আশ্বাসের মাধ্যমে আমরা উক্ত চাপসহ অন্যান্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করি ।

১৯৮৫-৮৬ সনে বাংলাদেশে সাহায্য প্রদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মার্কিনী এক দলিলে স্পষ্ট লেখা আছে "মার্কিন সরকার বাংলাদেশের সাথে তার সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং বাংলাদেশে মার্কিন সাহায্যের অনুপস্থিতিতে ১৯৭১ সালের মত রাজনৈতিক বিক্ষোভ ডেকে আনতে পারে, এশিয়ার আঞ্চলিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে বৃহত্তর মার্কিন স্বার্থের অভাবনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে ।"

২ । অর্থনৈতিক স্বার্থঃ বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের চুক্তিপত্রে এমনসব শর্তের উল্লেখ থাকে যেগুলি একদিকে দাতাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির স্পষ্ট লক্ষ্যকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে ঐ সাহায্যবেষ্টিত অর্থনীতি আদৌ স্বাধীন-সার্বভৌম কি'না সে প্রশ্ন উত্থাপনে বাধ্য করে । বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের চুক্তিপত্রে মহাজনী শর্তাদি মোটামুটি স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তবে চুক্তিপত্র কখনও জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয় না । এ সব বিষয়ে জনমত গ্রহণের কোনো রেওয়াজ আমাদের দেশে নেই । যেহেতু ৭০-৮০-র দশকে বৈদেশিক ঋণের বড় একটা অংশ এসেছে কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্পে এবং ৯০ ও বর্তমান দশকে গ্যাস খাতটি সম্ভাবনাময় খাত সেহেতু বন্ধনযুক্ত শর্ত-সঙ্কুল ঋণ-সাহায্যের শর্তাদি ও দাতাদের স্বার্থ-বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের প্রয়াস হিসেবে সাহায্যপুষ্ট একটি কৃষি প্রকল্পের চুক্তিনামার সংশ্লিষ্ঠ অংশ ও গ্যাসখাত সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হ'ল ।

১৯৭৭ সালে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প বাংলাদেশে হাতে নেয়া হয় । ঐ প্রকল্প সাহায্যের জন্য প্রণীত চুক্তিনামায় দু'টি বিষয় স্পষ্ট: প্রথমটি যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত, আর দ্বিতীয়টি দাতা দেশের উপদেষ্টা গ্রহণের বাধ্য বাধকতা সংক্রান্ত । যোগ্যতার বিচারের জন্য চুক্তিনামায় উল্লিখিত অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য বিষয়গুলি হ'ল:

- সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ কি কিউবাকে সাহায্য করে? কিংবা তার দেশের জাহাজ ও বিমানে করে কিউবার উদ্দেশ্যে মালামাল পরিবহন বন্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে কি?
- সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ কি এমন কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে যার ফলে ঐ দেশে মার্কিন নাগরিকদের কোনো সম্পত্তি জাতীয়করণ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছে? কিংবা অন্য কোনোভাবে মালিকানা কেড়ে নিয়েছে?
- সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ কি কমিউনিষ্ট দেশ? এই ঋণ কি ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়ার কোনো সাহায্যে ব্যবহৃত হবে?
- দেশটি কি জনগণের কার্যকলাপের দ্বারা মার্কিন সম্পদের ধ্বংস অথবা ক্ষতি সাধনে অনুমতি দিয়েছে কিংবা তার প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থ হয়েছে?
- দেশটির বাজেটে সামরিক খাতের অংশ কত? সামরিক সাজ-সরঞ্জাম কিনতে কত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়? আধুনিক অস্ত্র কিনতে কত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়?

- এমন কোনো পণ্য উৎপাদিত হয়েছ কি না যেটা অনুরূপ মার্কিন পণ্যের সাথে মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। এই অবস্থায় এমন কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা যাতে ঋণের সময়কালে উৎপাদিত সামগ্রীর ২০% এর বেশি আমেরিকায় রপ্তানি করা হবে না।
- দেশটি কি বিদেশি ও অভ্যন্তরীণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে?
- প্রকল্পটি কিভাবে বিদেশি মার্কিন বেসরকারি বাণিজ্য বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচিতে মার্কিন পুঁজিপতিদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে?
- মার্কিন অর্থনীতিতে এই প্রকল্প কিভাবে প্রভাব ফেলবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেনদেনের ভারসাম্য অবস্থা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে মার্কিন পণ্য সরবরাহ ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে কি?
- এই প্রকল্পের জন্য যে সব পণ্য ক্রয় করা হবে তা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা হবে?
- যদি মূলধন প্রকল্প হয় তবে মার্কিন জাতীয় স্বার্থের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে, মার্কিন ফার্মে এবং তাদের সহযোগী সংস্থার প্রকৌশলী ও পেশাগত সেবাকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে কি?
- এমন কোনো প্রকল্প সাহায্য দেয়া হচ্ছে কিনা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থের পরিপন্থী?

উল্লিখিত প্রকল্প দলিলের চুক্তিনামায় উপদেষ্টা নিয়োগ ও তাদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা দিতে আমরা বাধ্য থাকবো, সে সম্পর্কে শর্তাবলী হল নিম্নরূপঃ

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দশজন উপদেষ্টাকে নিযুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক উপদেষ্টাদের জন্য পাঁচটি জীপ গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। গাড়ীগুলোর কোনো ক্ষতি হলে উপদেষ্টারা দায়ী থাকবেন না।
- উপদেষ্টা ও তাদের অধীনস্থদের জন্য মাদকদ্রব্য, সিগারেট, খাদ্য, অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী কাষ্টম ডিউটি ও ট্যাক্স ফ্রি হতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে সেটা আয়োজন করে দিতে হবে।
- প্রকল্প আয়-ব্যয়ের অডিট অবশ্যই উপদেষ্টাদের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
- উপদেষ্টাদের বাড়ীর আসবাবপত্র, অফিসের সাজ সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুরে যাতায়াতের বিমান ভাড়া দিতে হবে। উপদেষ্টাকে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে অবস্থিত সদর দপ্তরে যাতায়াতের জন্য একবার এবং ট্রেনিং-এর জন্য ওয়াশিংটন ডি,সি, তে যাওয়ার জন্য যাতায়াত ভাড়া দিতে হবে।
- উপদেষ্টাদের ছুটিতে দেশে থাকার জন্য বিমান ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ দিতে হবে।
- উপদেষ্টার স্ত্রী ও চারজন ছেলে মেয়ের বাংলাদেশে যাওয়া আসার বিমান ভাড়া দিতে হবে।
- এই চুক্তির আওতাধীন সকল আন্তর্জাতিক ভ্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী বিমানে হতে হবে।
- ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য প্রত্যেক উপদেষ্টাকে বাড়তি ১,৭০০ ডলার করে দিতে হবে।
- উপদেষ্টাদের ব্যক্তিগত গাড়ী আনবার জন্য ভাড়া বাবদ ২,৫০০ ডলার করে দিতে হবে।
- উপদেষ্টার কাজ শেষে গাড়ী ফেরত নিয়ে যাবার জন্য আবার ২,৫০০ ডলার করে দিতে হবে।

- বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হলে উপদেষ্টাকে যাওয়া আসার বিমান ভাড়া দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে আত্নীয় স্বজন কেউ মারা গেলে, অসুস্থ হলে বা আহত হলে উপদেষ্টার পরিবারসহ যাতায়াত ভাড়া ও অন্যান্য খরচ বহন করতে হবে।
- উপদেষ্টার থাকার জন্য ৬টি বাড়ী সাজানো বাবদ মোট ৬৫১০,০০০=৬০,০০০ ডলার দিতে হবে।
- উপদেষ্টা প্রধানকে ফি বাবদ দিতে হবে ১ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ডলার। এই প্রকল্পে সিনিয়ার ঋণ বিশেষজ্ঞ মিঃ এফ ডি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

ইদানিং বিশ্বব্যাঙ্ক গ্যাস সেক্টরে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্গঠনের জন্য কিছু (শর্ত) সুপারিশ করেছে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্যাস কোম্পানীগুলোর পুনর্গঠন ও বিরাষ্ট্রীয়করণ নিশ্চিত করা।
- তেল ও গ্যাস সেক্টরের জন্য মিশ্র মালিকানা কাঠামো ভিত্তিক একটি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক কার্যকরী করা।
- গ্যাস খাতের জন্য একটা 'বাস্তবমুখী' মূল্য নির্ধারণ কাঠামো বাস্তবায়ন করা।
- তেল-গ্যাস খাতে বেসরকারি উদ্যোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, যাতে করে গ্যাস খাতে বিনিয়োগ রাষ্ট্রীয় বাজেটের ওপর নির্ভরশীল না হয়।
- চুক্তি/প্রভাব নাকচ করার ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার অধিকার/ক্ষমতা খর্ব করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক অচলাবস্থা বা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে 'দাতাদের অর্থায়িত' প্রকল্পের মধ্য থেকে 'কারিগরি সহায়তা' (টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স) গ্রহণে বাধ্য থাকা।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কাছে পেট্রোবাংলার পাওনা গ্যাস বিল পরিশোধ নিশ্চিত করা।

উল্লেখ্য যে, এই তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের পর সেটা কিভাবে বণ্টন হবে সে বিষয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিমতে, তেল-গ্যাস ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী বহুজাতিক কোম্পানী দু'ভাবে নিজেদের পাওনা নেবেঃ (১) খরচ ভাগাভাগি (cost sharing) এবং (২) মুনাফা ভাগাভাগি (profit sharing)। এ দুটো মিলিয়ে বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তোলিত গ্যাস-এর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পাবে বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীগুলো। আর বারবার খরচ বাড়িয়ে দেখালে এই হার আরও বেড়ে যাবে। এই চুক্তির ফলে দেশের গ্যাস পেট্রোবাংলাকে বহুজাতিক সংস্থা থেকে কিনতে হচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশি দামে এবং বৈদেশিক মুদ্রায়।

বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যঃ স্বার্থোদ্ধারের সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান
এইড কনসোর্টিয়াম ও বিশ্ব ব্যাংক

দাতাদের স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে এইড কনসোর্টিয়াম ও বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ১৯৮০-র দশক ও পরবর্তী সময়ে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক পরীক্ষামূলক তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ঋণজালে আবদ্ধ করেছে। পদ্ধতিগুলি হ'ল নিম্নরূপ:

১। খাতওয়ারি বিন্যাস ঋণ (Sectoral Adjustment Loan): এই ঋণের উদ্দেশ্য হ'ল সংশ্লিষ্ট খাতে নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন। যেমন ঋণের একটি অংশ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের জন্য, আর অন্য

অংশ জ্বালানী খাতে নীতি কাঠামো পরিবর্তনের জন্য (যার মধ্যে আছে ভর্তুকি, গ্যাস-তেল উত্তোলন নীতি, ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতি ইত্যাদি)

২। কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ঋণ (Structural Adjustment Loan): এই ঋণের সাথে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের সম্পর্ক নেই। এই ঋণ প্রাপ্তির শর্ত হ'ল জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে রাজি হওয়া।

৩। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (Structural Adjustment Programme: SAP) : এই কর্মসূচির শর্ত হ'ল ম্যাক্রো ইকনমিক স্থিতিকরণের লক্ষ্যে আবশ্যকীয় কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা। এসব সংস্কারের মধ্যে যেগুলি আমাদের দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল মুদ্রার অবমূল্যায়ন, সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস করা, ভর্তুকী তুলে নেয়া, বাজার উদারীকরণ, শ্রমবাজার উদারীকরণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলে নেয়া, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ নীতি বাতিল করা, বিরাষ্ট্রীয়করণ ত্বরান্বিত করা, কেন্দ্রিয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিথিল করা ইত্যাদি।

১৯৭৫-এর সেনাঅভ্যুত্থানের পরপরই বাংলাদেশে আইএমএফ এর শর্ত মেনে চলার শর্তে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কার্যক্রম জোরদার হয়। ঐসব শর্তের মধ্যে "কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির" (SAP) কথা আনুষ্ঠানিকভাবে বলা না হলেও মুদ্রা অবমূল্যায়ন ও মূল্য উদারীকরণসহ SAP-এর মূল উপাদানগুলো পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল। ঐ সময়ই বাংলাদেশে সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির বৃদ্ধি ঘটে। সামরিক শাসনের কাঠামোর মধ্যে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত পনের বছরে সাহায্য এসেছে আনুমানিক ৯৩,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ (সারণি ১৯-এর তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত)। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল এই যে সামরিক শাসিত কাঠামোর মধ্যে ১৯৭৫-৯০ কাল পর্বেই আমাদের পুরো রাষ্ট্র যন্ত্রটি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা ও দাতা সংস্থাগুলোর কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই সময়েই সমগ্র অর্থনীতি এইড কনসোর্টিয়ামের অধীনস্থ হয়ে পড়ে; আইএমএফ বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের ভিতরে বসে সরাসরি তদারকি শুরু করে; মন্ত্রণালয়সমূহে বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা নিযুক্ত হতে থাকে; বিশ্ব ব্যাংক তাদের ঢাকা অফিসে বসে অর্থনীতি পলিসি সমন্বয় করতে থাকে। ১৯৯০ সনে সামরিক শাসনের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটলেও এর আগের ১৫ বছরে কনসোর্টিয়াম নির্ভর যে অর্থনীতি ভিত গেঁড়েছে তাতে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হ'ল এইড কনসোর্টিয়াম । এমনকি উন্নয়নে কোন খাত কতটুকু অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়টিও তারাই নির্ধারণ করেন; পুরো বাজেট প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ তাদেরই কব্জাগত; তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যাংকিং সংস্কার। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের নামে যে অর্থ ঋণ দেয়া হচ্ছে তা অযোগ্য আমলা ও দালালদের পুনর্বাসন প্রকল্প ছাড়া কিছুই নয়। যারা ইতোমধ্যে লুটপাট ও দুর্বৃত্তায়নে যোগ্য সহযোগী বলে বিবেচিত তাদের আমৃত্যু পুনর্বাসনই মূল লক্ষ্য। এ ছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা বন্ধ করা, সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডারের কারসাজি, কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দেয়া, কৃষিতে সেচের জন্য জল দেবতা সৃষ্টি, পাট শিল্পকে ধ্বংসের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করা, কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাত থেকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর চাপানো – এসবই দাতাগোষ্ঠির সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংক ও কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে এমনভাবে তাদের মনের কথা বলে ফেলেছেন যা থেকে তাদের আসল উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করা আদৌ কঠিন নয়। যেমন বিভিন্ন সময়ে তারা বলেছেন ঃ

- "প্রত্যেক বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা চুক্তি করবার মত সময় আমাদের নেই। আমরা চাই নিয়মনীতি আরোপ করতে"।

- “আমরা বাজেট বানিয়ে দিতে পারবো না। আমরা মন্ত্রণালয়ের লোকজনের সাথে সরাসরি কাজ করি এবং দেখিয়ে দেই কি করে বাজেট বানাতে হয়”।
- “আপনারা অর্থনীতির জন্য ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করুন”।
- “শ্রমঘন শিল্প ছাড়া আপনাদের অন্য কোনো সুবিধা (তুলনামূলক) দেখি না”।
- “দারিদ্র দূরীকরণে দ্রুতলয়ে আমাদের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিকল্প দেখি না”।

শুধু বাংলাদেশেই নয় অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ কর্মসূচি ঐসকল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধোগতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। এ বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ হতে পারে নিন্মরূপঃ

১। ব্যাংকের কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচি (SAP) উন্নয়নশীল দেশে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার হ্রাস করেছে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য রফতানীর দিকে সম্পদ পরিচালন করতে বাধ্য করেছে।

২। ব্যাংকের শর্ত মেনে চলতে গিয়ে সামাজিক খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য) ব্যয় সংকোচন করতে হয়েছে।

৩। ব্যাংক দরিদ্রদের লক্ষ্যে চালিত ভর্তুকি (খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) তুলে নিতে বাধ্য করেছে।

৪। ব্যাংক কর ব্যবস্থাকে পশ্চাদমুখী করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার ফলে আমদানী দ্রব্যাদির (বিশেষ করে আমদানীকৃত খাদ্যদ্রব্যের) মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রকৃত মজুরী হ্রাস ও আমদানীকৃত খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গরীবরা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৬। ব্যাংক সূদের হার বৃদ্ধি করার ফলে ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেউলিয়াত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার উপর বিধি নিষেধ বাতিল করতে বাধ্য করেছে ফলে ধনিক শ্রেণী ইচ্ছেমতো তহবিল রপ্তানি করেছে, যা আসলে পুঁজি পাচার।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ঘোষিত লক্ষ্য ছিল – অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করা, ঋণ পরিশোধের ঘাটতি হ্রাস করা, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস অথবা স্থিতিশীল করা। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশসহ প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশেই ঘটেছে উল্টোটি। আর সে কারণেই নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন “আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করছে- এটা আসলে তাদের ভান। আইএমএফ হিপোক্রাট; গণতন্ত্র বিরোধী। ..... তারাও ওদের বিরুদ্ধাচরণ করে না। .... আসলে তারা যেটা করছে সেটা হল উন্নত দেশের জন্য উন্নয়নশীল দেশের বাজার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করতে বলছে; নিজেদের বাজার উন্মুক্ত করবে না ... এমন নীতি গ্রহণে বাধ্য করছে যার ফলে ধনী দেশ আরো ধনী হবে, আর দরিদ্ররা দরিদ্রতর হবে, সেই সাথে হবে ক্ষুব্ধ” (Stiglitz Joseph, 2002, পৃঃ XIV-XV)| আর সে কারণেই আমরা দেখছি গত কয়েক বছরে যখন বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সমন্বয় বা বিন্যাস কর্মসূচি (SAP) খুব তোড়জোরের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে তখনই উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি করে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মারা গেছে এবং বর্তমানে বিশ্বে ১২০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছেন (এই সংখ্যা ১০ বছর আগের তুলনায় দ্বিগুণ, যখন ১০ বছর আগের তুলনায় উন্নয়নশীল বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে ২০ শতাংশ)। আসলে দাতাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সহ এইড কনসোর্টিয়াম আমাদের দায়-দেনার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য আসলে কতখানি প্রয়োজন?

বাংলাদেশে গত প্রায় তিরিশ বছরে সরকারি খাতে যে ১৮০,০০০ কোটি টাকার 'ফরেন এইড' (ঋণ ও অনুদান) এসেছে সেটা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেনি। মানব উন্নয়নের মাধ্যস্থতাকারী পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার বিধান নিশ্চিত করতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা প্রশ্ন সাপেক্ষ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (GDP-র প্রবৃদ্ধি) অর্জনে ঐ ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা নেই। 'উন্নয়ন' বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের লক্ষ্য নয় – উপলক্ষ মাত্র। শুধু তাই নয় বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্বকীয় সার্বভৌম আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে সেটা দাতাগোষ্ঠির স্বার্থেই ঘটেছে। দাতাগোষ্ঠির স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থেই উত্তরোত্তর অধিকতর অগ্রাধিকার পেয়েছে শর্ত-বন্ধন কণ্টকিত প্রকল্প ঋণ। দাতাগোষ্ঠি উত্তরোত্তর অধিক হারে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সরাসরি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

'ফরেন এইড' নামক শিল্পটি একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশজ ও বিদেশি এলিটশ্রেণীর জীবনযাত্রা, মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণে সহায়তা করেছে। প্রবাহিত ১৮০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ১৩৫,০০০ কোটি টাকা ঐসব এলিটদেরা ধনস্ফীতিতে কাজে লেগেছে। ফলে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে, যার স্থায়ীকরণে রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে।

এমতাবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা বিবেচনা করতে পারি সেসব হতে পারে নিম্নরূপ:

০১. প্রতিকূল শর্তের সকল ঋণ-সাহায্য বর্জন করা; এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যমতে পৌঁছানো। বিষয়টি শুধুমাত্র জরুরিই নয় সেইসাথে সম্ভবও বটে। প্রথমত: আমরা আগেই দেখিয়েছি যে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি অর্থে) বিদেশি ঋণ-সাহায্য প্রবাহের সাথে সহসম্পর্কিত নয়। দ্বিতীয়ত: মোট জিডিপি-র অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের অবদান ক্রমহ্রাসমান–১৯৮০-৮১-তে ছিল জিডিপি-র ১০%, আর এখন জিডিপি-র ৪%। সেইসাথে জিডিপি-তে যা কিছু অমুল্যায়িত থাকছে (যেমন বাজর-সম্পর্কের আওতাবহির্ভূত উৎপাদন কার্যক্রম ও কালো-অর্থনীতির অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রম) সেগুলো হিসেব করলে বর্তমানে জিডিপি-র অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য হবে সর্বোচ্চে ২%, যা বর্জন করলে ক্ষতির সম্ভবনা নেই, বরঞ্চ দীর্ঘমেয়াদী লাভ অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়ত: গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহ আমাদের দেশে মানব উন্নয়ন (পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেনি।

০২. অনুকূল শর্তের ঋণ-সাহায্য প্রাপ্তির উৎস অনুসন্ধান করা এবং সম্ভাব্য প্রকৃতি অভিঘাত যাঁচাই পূর্বক সেটা গ্রহণ করা।

০৩. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির সব মাধ্যমগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

০৪. ঋণ-সাহায্য প্রাপ্তির অনুকূল সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈদেশিক দাতাগোষ্ঠির উপর চাপ প্রদানকারী কার্যক্রম ও সংস্থাসমূহে অধিকতর ফলপ্রদভাবে অংশগ্রহণ করা (যেমন জাতিসংঘে, তৃতীয় বিশ্ব পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন, গ্রুপ ৭৭-এ অধিকতর কার্যকরী অংশগ্রহণ, ঋণ মওকুফসহ[৭] আনুষঙ্গিক বিষয়ে জনমত গঠন ও জনচাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখা ইত্যাদি)।

[৭] সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Worldwatch Institute কর্তৃক প্রকাশিত Ending the Debt Crisis নিবন্ধের সুবিশ্লেষিত অংশটি উদ্ধৃত করা হ'লঃ "It is brutal that the rich got the loans but the poor got the debts ... The current debt initiative demands too much from debtors in terms of policy reform and offers too little in terms of debt reduction" (Roodman DM, 2001: 146, 148).